Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিনাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আফরিন মলি

রোলঃ 228021271

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিনাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আফরিন মলি

রোলঃ 228021271

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবতের ভয়াবহতা ও পরিনাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া আফরিন মলি, আইডিঃ 228021271 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবতের ভয়াবহতা ও পরিনাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাদিয়া আফরিন মলি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সাদিয়া আফরিন মলি

আইডিঃ 228021271

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

মানব সমাজের পরস্পরের প্রতি আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো নৈতিকতা। এই নৈতিকতাকে নষ্টকারী যেসব সামাজিক ব্যাধি রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম মারাত্মক ব্যাধি হলো 'গীবত'। গীবত এমন একটি পাপ যা ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজকে ধ্বংস করে দিতে পারে নিঃশব্দে। এটি মানুষের মানসিকতা ও চারিত্রিক গঠনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, পারস্পরিক সম্পর্ককে করে তোলে বিষাক্ত এবং সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। ইসলাম ধর্মে গীবতের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে গীবতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর ভয়াবহ পরিণামের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এই থিসিসে গীবতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, কুরআন ও হাদীসে এর বর্ণনা, এর কারণ ও উৎস, সমাজে এর প্রভাব, আধুনিক প্রেক্ষাপটে বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়ার আলোকে গীবতের রূপ, এবং গীবত থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা করা হবে। আশা করা যায়, এই গবেষণাপত্র পাঠকের নিকট গীবতের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে এবং একজন মুসলমান হিসেবে নিজেদেরকে এই গুনাহ থেকে মুক্ত রাখার প্রেরণা জোগাবে।

১ম অধ্যায়;গীবতের সংজ্ঞা

ইসলামে গীবত একটি ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ কর্ম হিসেবে চিহ্নিত। গীবত শব্দটি মূলত আরবি "غِيْبَةٌ" থেকে উদ্ভূত, যার শাব্দিক অর্থ হলো "অপস্থিত থাকা"। পরিভাষায়, কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন কোনো দোষ-ত্রুটি বা অপ্রিয় কথা বলা—যা সে শুনলে কষ্ট পাবে, তাকেই গীবত বলা হয়। তা সত্য হোক কিংবা বাস্তব, যদি সেটি তার অনুপস্থিতিতে বলা হয় এবং তার প্রতি অপমানসূচক হয়, তাহলে সেটিই গীবত হিসেবে গণ্য হয়।

ইসলামী পরিভাষায় গীবতের সংজ্ঞা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতের সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এক হাদীসে। তিনি বলেন:

> "তোমরা জানো গীবত কী?" সাহাবিরা বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: গীবত হলো, তুমি তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলো যা সে অপছন্দ করে।

কেউ বলল: আমি যদি যা বলি তা সত্যি হয়? তিনি বললেন: যদি তা সত্যিই হয় তবে তা গীবত, আর যদি তা মিথ্যা হয় তবে তা বুহতান (অপবাদ)।"
— (সহীহ মুসলিম: ২৫৮৯)

এই হাদীস থেকে গীবতের প্রকৃত রূপ স্পষ্ট হয় যে, গীবত শুধু কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ নয়, বরং তার সত্য দোষের কথাও কারো অনুপস্থিতিতে বলা গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

—

গীবত এবং অপবাদ (বুহতান) এর পার্থক্য:

গীবত: কারো সত্য দোষ-ত্রুটি বা আচরণ সম্পর্কে তার অনুপস্থিতিতে বলা।

বুহতান (অপবাদ): মিথ্যা কথা বলে কারো সম্মানহানি করা।

দুই ক্ষেত্রেই ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। গীবত হলে মানুষ সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হয়, আর বুহতান হলে সে হয় অন্যায়ভাবে অপমানিত।

২য় অধ্যায়;গীবতের ধরন

গীবত কেবল মুখের কথার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ নয়। ইশারা, লেখা, কার্টুন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কটূক্তি, এমনকি কাউকে ব্যঙ্গ করাও গীবতের আওতায় পড়ে। কেউ যদি হাসির ছলে অন্য কারো কণ্ঠ, হাঁটা, শারীরিক গঠন, পোশাক, বা আচরণ অনুকরণ করে থাকে যার উদ্দেশ্য অপমান—তবুও তা গীবতের শামিল।

কুরআনের আলোকে সংজ্ঞা:

আল-কুরআনে গীবতের ব্যাপারে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

> "তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা অপছন্দ করবে।"
— (সূরা হুজুরাত: ১২)

এই আয়াতে গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো ভয়াবহ ও ঘৃণিত কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে গীবতের জঘন্যতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

—

ইসলামিক পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে গীবত:

ইমাম নববী (রহ.) বলেন:
> "গীবত হলো, কাউকে তার অনুপস্থিতিতে এমন কিছু বলা যা সে শুনলে অপছন্দ করবে, তা তার শরীর, বংশ, চরিত্র, আচরণ, কথা, ধর্ম, কাপড়-চোপড়, বাড়ি, গাড়ি বা কোনো কিছু সম্পর্কেই হোক না কেন।"

ইমাম গাযযালী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন"-এ গীবতের বিভিন্ন দিক ও প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, গীবত এমন এক ব্যাধি যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

৩য় অধ্যায়;কুরআন ও হাদীসে গীবতের নিন্দা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানুষের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, মনোভাব—সবকিছুর মধ্যেই ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। সেই আলোকে গীবত একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা ব্যক্তিগত নৈতিকতা, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে দিতে সক্ষম। তাই কুরআন ও হাদীসে গীবতের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এই অধ্যায়ে আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণতি বিশদভাবে আলোচনা করবো।

কুরআনে গীবতের নিন্দা:

১. সূরা হুজরাত (৪৯:১২)

> "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকো। কারণ কিছু কিছু সন্দেহ গোনাহ। তোমরা একে অপরের দোষ খোঁজো না এবং কেউ যেন অপর কাউকে গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করবে। অতএব আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের প্রতি পরম দয়ালু।"

এই আয়াতটি গীবতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর ও দৃশ্যমান সতর্কতা। এখানে গীবতকারীর অবস্থাকে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা শুধু নিন্দনীয় নয়, বরং নৈতিকভাবে ভয়ানক এক কল্পনা। এটি একজন মুমিনের বিবেককে জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট।

২. সূরা কাওসার (১০৪:১–৩)

> "ধ্বংস সে ব্যক্তির, যে পশ্চাতে নিন্দা করে এবং সম্মুখে বিদ্রূপ করে। যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে ও বারবার গুনে দেখে। সে মনে করে, তার ধন-সম্পদ তাকে চিরকাল অমর রাখবে।"

এই আয়াতে নিন্দাকারী ও উপহাসকারীর কঠিন পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে, যারা মানুষকে গীবতের মাধ্যমে হেয় করে।

৩. সূরা তাওবা (৯:৭৯)

> "যারা স্বেচ্ছায় সদকা প্রদানকারীদের প্রতি এবং যারা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী (সাহায্য করতে চায়) তাদের প্রতি বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের বিদ্রূপের জবাব দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয় যে, গীবত ও বিদ্রূপ শুধু মানুষের প্রতি অবিচার নয়, বরং তা আল্লাহর অসন্তোষ ডেকে আনে।

—

হাদীসে গীবতের নিন্দা:

গীবতের সংজ্ঞা

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
"তোমরা জানো গীবত কী?"
সাহাবীগণ বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"
তিনি বললেন:
"তোমার ভাইয়ের এমন কিছু বলা, যা সে শুনলে অপছন্দ করবে।"
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "যদি তার মধ্যে সেই দোষটি থাকে?"
তিনি বললেন: "তাহলে সেটিই গীবত, আর যদি না থাকে তবে তা বুহতান (মিথ্যা অপবাদ)।"
— মুসলিম, হাদীস: ২৫৮৯

গীবতের শাস্তি

> রাসূল (সা.) বলেন:
"মেরাজের রাতে আমি এমন এক কওমের পাশ দিয়ে গেলাম, যাদের নখ ছিল তামার তৈরি। তারা তাদের মুখ ও বুক চেপে চেপে আঁচড়াচ্ছিল।"
আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে জিবরাঈল! এরা কারা?"
তিনি বললেন, "এরা সেইসব লোক যারা মানুষের গীবত করত এবং তাদের সম্মান নষ্ট করত।"
— আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৭৮

এই ভয়ংকর দৃশ্য গীবতকারীর আখিরাতের শাস্তি কতটা ভয়াবহ হবে, তা প্রকাশ করে।

গীবতের কারণে আমল নষ্ট হয়

> রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"তোমরা জানো মুফলিস কে?"

সাহাবীগণ বললেন, "আমাদের মধ্যে মুফলিস সেই ব্যক্তি যার টাকা-পয়সা নেই।"
তিনি বললেন:
"আমার উম্মতের মধ্যে মুফলিস হলো সেই ব্যক্তি, যে নামাজ, রোজা, হজসহ অনেক নেক আমল নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে আসবে। কিন্তু সে গীবত করেছে, অপবাদ দিয়েছে, কাউকে আঘাত করেছে, কারো সম্পদ খেয়েছে ইত্যাদি। ফলে তার নেক আমল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার দেয়া হবে, শেষে যদি আমল শেষ হয়ে যায়, তবে ক্ষতিগ্রস্তদের গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"
— মুসলিম, হাদীস: ২৫৮১

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই, গীবত ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু একটি সামাজিক অপরাধ নয়, বরং এক ভয়াবহ আখলাকী (নৈতিক) ব্যাধি। এটি মানুষকে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, ফিতনা ও বিভাজনের দিকে ধাবিত করে। একটি সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে এর ক্ষমতা অপরিসীম। তাই একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো—নিজেকে এই পাপ থেকে দূরে রাখা এবং অন্যদেরও এ থেকে সতর্ক করা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে গীবতের ভয়াবহতা থেকে হিফাজত করুন। আমীন।

—

৪র্থ অধ্যায়;গীবতের ধরণ ও প্রকারভেদ

গীবত একটি বহুমাত্রিক পাপ। এটি কেবল মুখের কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং শব্দ, দৃষ্টি, অঙ্গভঙ্গি, এমনকি ইশারার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। এই অধ্যায়ে গীবতের বিভিন্ন ধরণ ও প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে, যাতে বুঝা যায় কীভাবে এটি মানুষের জীবনে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কোন কোন রূপে তা সংঘটিত হয়।

১. মৌখিক গীবত:

গীবতের সবচেয়ে প্রচলিত ধরন হলো মুখে কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষ বা দুর্বলতা প্রকাশ করা।

উদাহরণস্বরূপ:
অমুক লোকটি চোর, মিথ্যাবাদী, অহঙ্কারী বা বদমেজাজি।
অমুক মহিলা অশ্লীল পোশাক পরে।
অমুক ছাত্র কখনও ঠিকমতো পড়ে না।

এসব মন্তব্য যদি বাস্তব হয়, তবুও তা গীবত হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তা বুহতান বা অপবাদ হিসেবে আরও ভয়াবহ গোনাহ।

—

২. ইশারায় গীবত:

কেউ কোনো ব্যক্তির দিকে আঙুল তুলে, চোখ টিপে, ঠোঁট বাঁকিয়ে বা কটূ ভঙ্গিমায় অন্যজনকে বুঝিয়ে দেয় যে সে কারো প্রতি কটাক্ষ করছে—তাহলে এটিও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে এসেছে:

> “তুমি এমন ব্যক্তির কথা অনুসরণ করো না, যে অন্যদের তুচ্ছ করে এবং দোষ অনুসন্ধানে লিপ্ত।”
— সূরা কলম: ১০

—

৩. লিখিত গীবত:

আজকের যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp ইত্যাদি) অন্য কারো দোষ তুলে ধরা, কটূক্তি করা কিংবা সমালোচনামূলক পোস্ট, স্ট্যাটাস কিংবা মন্তব্য—সবই লিখিত গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী দৃষ্টিতে লিখে, শেয়ার করে বা ভিডিও বানিয়ে গীবত করা মুখে বলার চেয়ে অধিক গোনাহের কারণ হতে পারে, কারণ এতে আরও বেশি মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে পড়ে।

—

৪. ছদ্মবেশী গীবত (Backhanded ghibat):

অনেক সময় কেউ সরাসরি কিছু না বলে, এমনভাবে কথা বলে বা মন্তব্য করে যাতে শ্রোতা বুঝে ফেলে সে আসলে কাকে ইঙ্গিত করছে।

উদাহরণ:
"আলহামদুলিল্লাহ, আমি ওর মতো মিথ্যা বলি না।"
"সবাই জানে কে কী করে, নাম না বললেও চলবে!"

এই ছদ্মবেশী পদ্ধতিতেও গীবত হয়, কারণ এতে অন্যের চরিত্রহানী হয়।

—

৫. পরোক্ষ গীবত বা প্রশ্নের আড়ালে গীবত:

কেউ হয়তো বললো, "তোমাদের ওখানে যে নতুন শিক্ষক এসেছেন, তিনি কি আগেও এমনটাই করতেন?"
এই ধরনের প্রশ্নের মধ্যে অপ্রকাশ্য কটূতা থাকে, যা শ্রোতার মনে সংশয় সৃষ্টি করে।

এই ধরণের গীবতের ভয়াবহতা হলো, এটি ধোঁয়াশার মাধ্যমে চরিত্রহনন করে এবং প্রতিকার করাও কঠিন।

৬. গীবত বলে না বলে হলেও শ্রবণ করে চুপ থাকা:

কেউ যদি গীবত করে আর পাশে থাকা ব্যক্তি কিছু না বলে চুপ থাকে, তাহলে সেও গীবতের দায়ে অংশীদার হবে।

> রাসূল (সা.) বলেন:
"যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে গীবত শুনে এবং প্রতিরোধ না করে, সে গীবতকারীর সঙ্গী হিসেবে গণ্য হবে।"
— মিশকাত, হাদীস: ৪৮৩৮

তাই শুধু মুখে বলা নয়, বরং গীবতের প্রতি মৌন সম্মতিও অপরাধ।

—

৭. রসিকতার ছলে গীবত:

অনেকে হালকা চালে মজার ছলে অন্যের ব্যঙ্গ করে বা কটূক্তি করে থাকে। এটি যদি অন্যের অপমান করে বা অশোভন মন্তব্য হয়, তবে তা ইসলামী দৃষ্টিতে গীবতের পর্যায়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

> "কোনো মানুষ যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে রসিকতা করে তাকে লজ্জিত করে, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লজ্জায় ফেলবেন।"
— তাবারানি

—

৮. গীবতের ধোঁকাবাজি রূপ—সতর্কতা বা উপকারের ছলে গীবত:

অনেকে বলে, "আমি তো শুধু তাকে সতর্ক করছি, যাতে সে জানে অমুক কী করছে।" কিন্তু সতর্কতার নামে যদি কারো গোপন দোষ বা দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ করা হয়, তাও গীবত হিসেবে পরিগণিত হয়।

ইসলামে সতর্কতা করার নিয়ম আছে, কিন্তু তা সম্মানহানির মধ্যে পড়লে তা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

—

৯. ধর্মীয় লোকদের গীবত—সাধু সেজে গীবত
অনেকে ইসলামি ভাষা ব্যবহার করে গীবত করে:

"আল্লাহ তাকে হেদায়েত দিন, সে এখনো অনেক গোনাহে লিপ্ত।"
"আমরা তার জন্য দুআ করি, সে যেন ঠিক হয়ে যায়।"

আসলে এটি কৌশলী গীবত। ইসলামী পরিভাষায় মোড়কবদ্ধ হলেও উদ্দেশ্য থাকে দোষ তুলে ধরা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, গীবতের রূপ বহুবিধ এবং তা শুধু শব্দ বা মুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দৃষ্টি, অঙ্গভঙ্গি, লেখা, ইশারা, মনোভাব—সবকিছু গীবতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যদি তা অন্যের অনুপস্থিতিতে তার অপমান, সমালোচনা বা দোষ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। একজন মুমিনের উচিত, নিজের মুখ, কলম ও আচরণকে সংযত রাখা এবং গীবতমুক্ত পরিবেশ গঠনে ভূমিকা রাখা। কারণ গীবত শুধু একক অপরাধ নয়, এটি একটি সামাজিক ব্যাধি, যা বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য নষ্ট করে দেয়।

৫ম অধ্যায়;গীবতের ইতিহাস ও অতীত সমাজে এর প্রভাব

গীবত বা পরনিন্দা শুধু আধুনিক সমাজের সমস্যা নয়, বরং মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই এটি একটি গুরুতর নৈতিক ব্যাধি হিসেবে পরিচিত। প্রাচীন সমাজ, নবী-রাসূলদের যুগ, ইসলামপূর্ব আরব, এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সভ্যতাগত ঐতিহ্যেও গীবতকে একটি ঘৃণিত ও ধ্বংসাত্মক অভ্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে গীবতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অতীত সমাজে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. প্রাচীন সমাজে গীবতের অস্তিত্ব:

গীবতের অস্তিত্ব প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। হিন্দু ধর্মে "পরনিন্দা"কে মারাত্মক পাপ বলা হয়েছে। উপনিষদ, বেদ ও গীতা অনুযায়ী, পরের দোষ খোঁজা, তাদের সম্মানহানি করা ব্যক্তিকে আত্মিক উন্নতি থেকে বঞ্চিত করে। বৌদ্ধ ধর্মে "সম্মা বাক" বা সঠিক বাক্‌চারণ একটি আটটি অষ্টাঙ্গিক মার্গের একটি, যেখানে কু-কথা, গীবত ও মিথ্যা বর্জনীয়।

প্রাচীন গ্রিক দর্শনে, যেমন সক্রেটিস ও প্লেটো গীবত বা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। সক্রেটিস তার "তিনটি ছাঁকনি" পরীক্ষা দ্বারা গীবতের বিরুদ্ধে শিক্ষাদান করেছেন—যা সত্য, ভাল এবং প্রয়োজনীয় না, তা বলা উচিত নয়।

—

২. ইসলামপূর্ব আরব সমাজে গীবত:

ইসলামপূর্ব আরবে গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় পরনিন্দা ছিল সামাজিক শত্রুতার অন্যতম অস্ত্র। তখনকার কবিতা ও বক্তৃতায় শত্রু গোত্রের দুর্নাম রচনার মাধ্যমে সামাজিক বিভেদ বাড়ানো হতো। বিশেষত "হিজা" বা ব্যঙ্গাত্মক কবিতার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ছোট করা একধরনের গীবত হিসেবেই বিবেচিত হয়।

গীবত আরবদের মাঝে একটি সামাজিক ব্যাধি হয়ে উঠেছিল, যার মাধ্যমে হিংসা, বিদ্বেষ ও বিভাজন সৃষ্টি হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই ধারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।

—

৩. কুরআনের মাধ্যমে গীবতের বিরুদ্ধে প্রথম দৃঢ় অবস্থান:

ইসলাম গীবতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করে। সূরা হুজুরাতে গীবতের তুলনা করা হয়েছে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে। ইসলামের আগমনের পর গীবতকে শুধু সামাজিক অপরাধ নয় বরং আখিরাতের শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আয়াত উদাহরণ:
> "হে মুমিনগণ! ... তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে? তোমরা তো একে ঘৃণা করো।"
(সূরা হুজুরাত, আয়াত ১২)

এই আয়াত শুধু আরব সমাজ নয় বরং সমগ্র মানবজাতিকে গীবতের ভয়াবহতা থেকে সতর্ক করেছে।

---

৪. নবীজীর যুগে গীবতের প্রতিক্রিয়া:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং গীবতের বিরুদ্ধে নিরলস প্রচার চালিয়েছেন। একাধিক হাদীসে তিনি গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণতি ব্যাখ্যা করেছেন।

হাদীস উদাহরণ:

> "তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাকো, কেননা গীবত ব্যভিচারের চেয়েও কঠিন।"
(মুসনাদে আহমদ)

নবীজির যুগে একবার একজন সাহাবি অন্য একজন সাহাবির পা হাঁটার ভঙ্গিকে কটাক্ষ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তৎক্ষণাৎ তাকে সতর্ক করে বলেন—তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করেছ।

এই দৃষ্টান্তগুলোতে বোঝা যায়, নবীজি (সা.)-এর সমাজে গীবতের প্রতি সহনশীলতা ছিল না।

---

৫. ইসলামের স্বর্ণযুগে গীবতের প্রতি অবস্থান:

খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ, বিশেষত হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে গীবতের ব্যাপারে কঠোর নীতিমালা ছিল। তিনি বলেন—

> “তোমার ভাই সম্পর্কে কোনো অপ্রমাণিত কথা শুনলে তার পক্ষে ৭০টি ব্যাখ্যা দাও, যাতে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করা যায়।”

এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি ন্যায়ভিত্তিক, সহনশীল সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে, যেখানে গীবতের স্থান ছিল না।

---

৬. মুসলিম ইতিহাসে গীবতের প্রভাব:

মুসলিম ইতিহাসে অনেক সময় গীবত ও অপপ্রচার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট তৈরি করেছে। বিশেষত খেলাফত বা রাজশক্তির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করতে গীবতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে ইসলামী পণ্ডিতগণ সর্বদা গীবতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ “ইহইয়া উলূমুদ্দীন”-এ একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় উৎসর্গ করেছেন গীবতের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করে।

গীবতের ইতিহাস প্রমাণ করে এটি একটি চিরন্তন মানবিক দুর্বলতা। তবে ইসলামী দর্শন ও নবীজীর শিক্ষা অনুসারে, গীবত থেকে বেঁচে থাকা শুধু নৈতিকতার নয় বরং আত্মার পরিশুদ্ধির উপায়। অতীত সমাজের অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায় যে, গীবত সামাজিক স্থিতি ও ঐক্যের জন্য একটি বড় হুমকি। তাই আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে গীবত বর্জনের শিক্ষা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

—

৬ষ্ঠ অধ্যায়;গীবতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুনাহ (তোহমত, চোগলখোরি, মুনাফিকি)

গীবত একটি মারাত্মক নৈতিক ব্যাধি, যা সমাজে বিভেদ, হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ায়। এই গুনাহ একা আসে না—এর সাথে আরও কিছু মারাত্মক পাপ জড়িত থাকে, যেগুলো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো গীবতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি গুরুতর গুনাহ: তোহমত (অসত্য অপবাদ), চোগলখোরি (নামিমা) ও মুনাফিকি (দ্বিমুখিতা)।

---

১. তোহমত (অসত্য অপবাদ):

তোহমত বা অপবাদ অর্থ হলো—কারও বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করা, যা মিথ্যা এবং প্রমাণহীন। এটি গীবতের চেয়েও ভয়ানক, কারণ গীবত সত্য বিষয় হলেও পেছনে বলার অপরাধ, আর তোহমত হলো মিথ্যা কথা বলে অন্যের সম্মানহানি করা।

কুরআনের বর্ণনা,
"যারা সচ্চরিত্র নারীদের প্রতি অপবাদ দেয়, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।"
(সূরা নূর, আয়াত ২৩)

হাদীস,
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,
"যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন দোষে অভিযুক্ত করে যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের পুঁজে বসিয়ে রাখবেন।"
(আবু দাউদ)

তোহমতের ফলাফল
নিরপরাধ মানুষ সমাজে অপমানিত হয়।

পরিবারে বিচ্ছেদ ও কলহ দেখা দেয়।
সমাজে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক ছড়ায়।

---

২. চোগলখোরি (নামিমা):

চোগলখোরি বা নামিমা হলো—একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করা বা ফিতনা সৃষ্টি করা। এটি সমাজে ফাটল ধরানোর অন্যতম প্রধান অস্ত্র।

কুরআন,
"ধ্বংস হোক সেই লোক, যে পশ্চাতে লাগা ও চোগলখোর।"
(সূরা হুমাযা, আয়াত ১)

হাদীস,
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,
"চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"
(সহীহ মুসলিম)

চোগলখোরির ক্ষতিকর দিক
বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়।
দলাদলি ও গোপন শত্রুতা সৃষ্টি হয়।
মুনাফিকি ও কপটতা বাড়ে।

বাস্তব উদাহরণ
অনেক পরিবার বা অফিসে দেখা যায়, চোগলখোর ব্যক্তি একজনের কথা আরেকজনকে লাগিয়ে দেয়, যার ফলে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয় এবং বিশ্বাস নষ্ট হয়।

---

৩. মুনাফিকি (দ্বিমুখিতা):

মুনাফিকি হলো—অন্তরে কুফর রেখে বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রদর্শন করা। এটি শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আচরণগত দ্বিমুখিতা বা দৃষ্টিকোণগত ভণ্ডামিও এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস,
"মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে।"
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

গীবতের সঙ্গে সম্পর্ক
মুনাফিক ব্যক্তি সাধারণত পেছনে গীবত করে, সামনে প্রশংসা করে। তারা সমাজে ফিতনা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়।

কুরআনের বর্ণনা,
"মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।"
(সূরা নিসা, আয়াত ১৪৫)

গীবতের মতো মারাত্মক গুনাহ সমাজে একা আসে না। এর সঙ্গে থাকে তোহমত, চোগলখোরি ও মুনাফিকি, যা পারস্পরিকভাবে একে অপরকে শক্তিশালী করে। এই চারটি পাপ একত্রে সমাজকে নৈতিকভাবে ভেঙে ফেলে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের শান্তির জন্য এসব গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা জরুরি। ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলোকে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা পরকালে কঠিন পরিণতি ডেকে আনবে।

—

৭ম অধ্যায়;গীবতের কারণ ও উৎস

গীবত একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনে। গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে জোরালোভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু এই গোনাহটি কেন মানুষ করে থাকে, তার পেছনে রয়েছে কিছু মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় দুর্বলতা। এ অধ্যায়ে গীবতের প্রধান উৎস ও কারণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, যাতে মানুষ নিজেকে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে এই পাপ থেকে বিরত রাখতে পারে।

---

১. হিংসা ও ঈর্ষা:

গীবতের অন্যতম প্রধান কারণ হলো হিংসা। অন্যের উন্নতি, সুখ-সামর্থ্য, জ্ঞান, জনপ্রিয়তা বা ইবাদতের প্রতি ঈর্ষা থেকেই গীবতের জন্ম হয়। গীবতকারী চায়, যাকে সে হিংসা করে, তাকে সমাজে হেয় ও অপমানিত করা হোক। এই মানসিকতা থেকে সে সেই ব্যক্তির দোষ বা দুর্বলতা অন্যের সামনে তুলে ধরে।

কুরআন,

> “তারা কি মানুষকে হিংসা করে যা আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে দান করেছেন?”
— সূরা আন-নিসা: ৫৪

হাদীস,

> রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা কোরো না, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কোরো না... এবং কেউ যেন কারও পেছনে গীবত না করে।”
— সহীহ বুখারী ও মুসলিম

হিংসা এমন একটি মানসিক ব্যাধি, যা মানুষকে শুধু গীবতের দিকেই ঠেলে দেয় না, বরং ধীরে ধীরে বড় বড় গোনাহে জড়িত করে।

---

২. অহংকার ও আত্মপ্রশংসা:

কিছু মানুষ নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে উত্তম মনে করে, তাই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অন্যের দোষ খুঁজে বের করে তা প্রচার করে। এই অভ্যাস থেকে গীবত জন্ম নেয়।

কুরআন,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিতদেরকে পছন্দ করেন না।"
— সূরা নাহল: ২৩

হাদীস,

> "যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র অহংকার অন্তরে রাখবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"
— সহীহ মুসলিম

অহংকার মানুষের হৃদয়কে অন্ধ করে দেয়। মানুষ তখন অন্যের দোষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, নিজের দোষ সম্পর্কে অজ্ঞান থাকে।

৩. রসিকতা, ঠাট্টা-তামাশা ও আড্ডাবাজি:

অনেক সময় মানুষ আড্ডায় বা মজার ছলে গীবত করে থাকে। হাস্যরস, কৌতুক কিংবা গল্প করার সময় কারও ব্যক্তিগত বিষয় তুলে এনে হাসাহাসি করা হয়, যা গীবতের শামিল।

হাদীস,

> রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের ত্রুটি নিয়ে এমনভাবে কথা বলে যে, অন্যরা হাসে—সে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনার শিকার হবে।"
— মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস: ৪৮২৩

এই ধরণের গীবত সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। মানুষ এটিকে অপরাধ মনে করে না, ফলে এই অভ্যাস দিন দিন বেড়ে চলে।

---

৪. প্রতিশোধ ও শত্রুতাবোধ:

কেউ যদি কারও কাছ থেকে কষ্ট পায়, তাকে অপমানিত করে বা তার সঙ্গে শত্রুতা করে, তখন সে সেই ব্যক্তির নামে অপবাদ ও বদনাম ছড়ায়, যা গীবতের রূপ নেয়। প্রতিশোধপরায়ণতা ও বিদ্বেষ এই কাজকে আরও জোরদার করে তোলে।

হাদীস,

> “তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপরের সম্মানহানী না করে।”
— সহীহ মুসলিম

গীবতকারী ভাবে, মুখোমুখি না গিয়ে পেছনে অপবাদ ছড়িয়ে প্রতিশোধ নেওয়া নিরাপদ। কিন্তু এই ধারণা ইসলামী শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

---

৫. দীনী দুর্বলতা ও তাকওয়ার অভাব:

আল্লাহভীতি ও পরকালের জবাবদিহিতার বোধ না থাকলে মানুষ গীবতের ভয়াবহতা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় না থাকে, তারা গীবতকে হালকা গোনাহ মনে করে, এবং এর পরিণাম নিয়ে ভাবে না।

কুরআন,

> “তোমাদের কেউ কি চায় তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে?”
— সূরা হুজরাত: ১২

গীবতের ভয়ে কাঁপতে শেখার জন্য তাকওয়ার চর্চা এবং আখিরাতের ভয় থাকা আবশ্যক।

---

৬. আত্মবিশ্বাসের অভাব:

অনেকেই নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে বা নিজেকে বড় দেখাতে অপরের দোষ তুলে ধরে। তারা নিজের অপূর্ণতাকে ঢাকতে চায় অন্যের দুর্বলতার মধ্যে।

আধুনিক মনস্তত্ত্ব বলছে, যারা আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগে, তারা প্রায়শঃ অন্যকে হেয় করে নিজেকে উপরে তোলার চেষ্টা করে।

---

৭. খারাপ সঙ্গ ও পরিবেশ:

যে সমাজে গীবত প্রচলিত, যেখানে বন্ধুমহলে পরনিন্দা একটি স্বাভাবিক আড্ডার বিষয়, সেখানে একজন সাধারণ মানুষও সহজেই এতে জড়িয়ে পড়ে। বন্ধুর প্ররোচনা, সামাজিক চাপে গীবতকে এক ধরনের সামাজিক বিনোদনে পরিণত করা হয়।

হাদীস,
> "মানুষ তার বন্ধুদের দ্বীনের উপর থাকে, সুতরাং কেউ কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে, তা দেখে নিক।"
— তিরমিযী: ২৩৭৮

সঙ্গদোষ গীবতের মতো গোনাহকেও মানুষের কাছে স্বাভাবিক ও সহজ করে তোলে।

---

৮. সময় নষ্ট ও অলসতা:

যে ব্যক্তি জীবনের সময় সঠিকভাবে ব্যবহার করে না, যে অলস ও উদ্দেশ্যহীন, সে অনেক সময় গীবতের মতো অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় সময় নষ্ট করে। অলস জবান গীবতের জন্য একটি বড় মাধ্যম।

---

৯. দোষ খুঁজে বেড়ানোর অভ্যাস:

কিছু মানুষ সর্বদাই অন্যের ভুল খুঁজতে ভালোবাসে। এই 'ফল্ট ফাইন্ডার'রা নিজেরা সাধু না হয়ে অন্যের ভুল তুলে ধরে নিজেদের জ্ঞানী ও ধার্মিক মনে করে। এর মধ্য দিয়েও গীবতের সৃষ্টি হয়।

কুরআন,

> “তোমরা গোয়েন্দাগিরি কোরো না এবং একে অপরের গীবত কোরো না।”

— সূরা হুজরাত: **১২**

গীবতের উৎস ও কারণগুলো বুঝে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমস্যার মূল না জানলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। হিংসা, অহংকার, দীনী দুর্বলতা, খারাপ সঙ্গ—এসবই গীবতের পেছনে কাজ করে। গীবত থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রথমে আমাদের এই কারণগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে হবে। কুরআন-হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধি, নফসের নিয়ন্ত্রণ এবং তাকওয়ার মাধ্যমে গীবতের পথ রোধ করা সম্ভব।

৮ম অধ্যায়;গীবত ও আধুনিক সমাজ: সোশ্যাল মিডিয়ার আলোকে

আধুনিক বিশ্ব প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে পরিণত হয়েছে, যেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। এই সুবিধাজনক যোগাযোগব্যবস্থা যেমন ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে, তেমনি একে ব্যবহার করে নেতিবাচক অনেক আচরণও প্রচলিত হয়েছে। গীবত বা পরনিন্দা—যা ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে—এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও বিস্তৃত আকারে দেখা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা গীবতের প্রকৃতি ও এর ভয়াবহতা আধুনিক সমাজে, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রেক্ষাপটে আলোচনা করবো।

---

১. গীবতের আধুনিক রূপ:

গীবতের প্রচলিত রূপ যেমন মুখে মুখে কারও দোষচর্চা করা, তা এখন ডিজিটাল রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন মানুষ ফেসবুক, টুইটার (এক্স), ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব বা ব্লগে অন্যের দোষ প্রকাশ করছে স্ট্যাটাস, মন্তব্য, মিম, ভিডিও, গসিপ বা "এক্সপোজ" এর মাধ্যমে।

উদাহরণ:
কোন ব্যক্তি বা সেলিব্রেটির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কটুক্তি করা।
কাউকে ট্যাগ করে বা নাম না নিয়ে "স্ট্যাটাস গীবত" করা।
ভাইরাল ভিডিওর নিচে অবমাননাকর কমেন্ট।
ফেক একাউন্ট থেকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ বা অপপ্রচার।

---

২. সোশ্যাল মিডিয়ার গীবতের ভয়াবহতা

ব্যাপকতা ও গতিশীলতা:
একবার কেউ যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় গীবত করে, তা মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বাস্তব জীবনে যা সীমিত পরিসরে হয়, অনলাইনে তা বৈশ্বিক হয়ে ওঠে।

চিরস্থায়ী দাগ:

ডিজিটাল কনটেন্ট সহজে মুছা যায় না। কেউ যদি কোনো ভিডিও বা পোস্টে গীবতমূলক মন্তব্য করে, তা স্ক্রিনশট বা শেয়ার হয়ে চিরস্থায়ী আকার ধারণ করে।

সম্মানহানির মাত্রা:
যার বিরুদ্ধে গীবত করা হয়, তার মান-সম্মান, পারিবারিক সম্পর্ক, চাকরি বা ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

---

৩. হাদীস ও ইসলামের নির্দেশনা:

গীবত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"তোমরা গীবত থেকে বাঁচো, কারণ গীবত ব্যভিচারের চেয়েও কঠিন।"
(মিশকাত)

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন:
"যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জতের প্রতি হস্তক্ষেপ করবে না, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ستر করবেন।"
(তিরমিযী)

এই হাদীসগুলো ইঙ্গিত করে যে, কাউকে অপমান করা বা তার দোষ প্রকাশ করা, বিশেষ করে তা যদি বহু লোকের সামনে হয় (যেমন সোশ্যাল মিডিয়ায়), তবে তা মারাত্মক পাপ।

---

৪. গীবতের সামাজিক প্রভাব:

সম্পর্ক নষ্ট হয়
সোশ্যাল মিডিয়ায় গীবতমূলক আচরণ পরিবার, বন্ধু বা সহকর্মীদের সম্পর্ক ভেঙে দেয়।

মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়
অনেকেই গীবতের শিকার হয়ে বিষণ্ণতা, আত্মঘাতী চিন্তা কিংবা সমাজবিচ্ছিন্নতায় ভোগেন।

সমাজে নেতিবাচক সংস্কৃতি জন্ম নেয়

গীবতকে কেউ কেউ বিনোদনের অংশ মনে করে। এতে দোষকারীর অপরাধবোধ হ্রাস পায় এবং পাপ স্বাভাবিক মনে হয়।

করণীয়:

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ

কোনো কিছু পোস্ট করার আগে চিন্তা করা—"এটা কি গীবতের শামিল হবে?"

দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন

ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী মানুষের ভুল গোপন রাখা ও সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত, প্রকাশ করার নয়।

নৈতিক শিক্ষা ছড়ানো

সোশ্যাল মিডিয়ায় গীবত-বিরোধী বার্তা ছড়িয়ে মানুষের চেতনা জাগানো যেতে পারে।

ডিজিটাল তাকওয়া

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে আল্লাহর ভয় বা তাকওয়ার অনুভব থাকা দরকার।

—

গীবত কেবল একটি ব্যক্তিগত পাপ নয়, বরং সমাজ ধ্বংসের পথপ্রদর্শক। আধুনিক সমাজে, বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়ায়, এই গীবতের প্রচার বহুগুণে বেড়েছে। একজন মুসলমানের দায়িত্ব হলো নিজেকে এবং অন্যকে এই ভয়াবহ গুনাহ থেকে রক্ষা করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে গীবত থেকে হেফাজত করুন এবং নৈতিক ও কল্যাণকর ডিজিটাল জীবন যাপন করার তাওফিক দিন। আমিন।

—

৯ম অধ্যায়;গীবতের প্রতিক্রিয়া: ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক

গীবত এমন এক গুনাহ, যার প্রভাব শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকে দুর্বল করে দেয়। কেউ গীবতের শিকার হলে তার মনে যেমন ঘৃণা, কষ্ট ও অসন্তোষ জন্ম নেয়, তেমনি গীবতকারী ব্যক্তি নিজেও আত্মিক প্রশান্তি হারিয়ে ফেলে। এ অধ্যায়ে গীবতের বহুমাত্রিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

---

১. গীবতের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া:

আত্মিক ও মানসিক ক্ষয়

গীবত করা বা গীবতের শিকার হওয়া—উভয় অবস্থায়ই মানুষের মনে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। গীবতকারী ব্যক্তি ধীরে ধীরে আত্মিক শান্তি হারিয়ে ফেলে, কারণ সে সবসময় অন্যের দোষ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

অন্যদিকে, যার বিরুদ্ধে গীবত করা হয়, সে লজ্জা, অপমান, হতাশা ও বিষণ্ণতায় ভোগে।

ইবাদতে মনোযোগ কমে

হাদীস অনুযায়ী, গীবতকারী ব্যক্তির নেক আমল অন্যের নামে স্থানান্তরিত হয়। এতে সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হাদীস,

“কোন ব্যক্তি যদি গোপনে গীবত করে আর তওবা না করে, তবে তার নেক আমল ওই ব্যক্তির নামে লেখা হয়, যার গীবত করা হয়েছে।”

(আল-আদবুল মুফরাদ)

আত্ম-অবিশ্বাস ও একাকীত্ব

গীবতের অভ্যাস ধীরে ধীরে মানুষকে একা করে দেয়। মানুষ তার ওপর আস্থা হারায় এবং কোনো গোপন কথা শেয়ার করতে ভয় পায়।

২. গীবতের পারিবারিক প্রতিক্রিয়া:

পারিবারিক অশান্তি
গীবত পারিবারিক কলহের অন্যতম কারণ। আত্মীয়-স্বজন, শ্বশুরবাড়ি, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী—সব সম্পর্কেই গীবতের ছায়া পড়লে তা সম্পর্কের ভিত নষ্ট করে।
যেমন:

এক আত্মীয় আরেক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে গোপনে অপবাদ দিলে পরিবারে বিভক্তি সৃষ্টি হয়।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হলে তা বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়াতে পারে।

সন্তানদের উপর প্রভাব
যদি কোনো ঘরে নিয়মিত গীবত হয়, তবে সন্তানরাও সেই মানসিকতা নিয়ে বড় হয়। তারা মানুষের দোষ খোঁজা ও গীবতকেই স্বাভাবিক মনে করে।

পরিবারের সম্মানহানি
যদি কোনো সদস্য গীবত করে এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ পায়, তবে পুরো পরিবারের মর্যাদা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা কমে যেতে পারে।

৩. গীবতের সামাজিক প্রতিক্রিয়া:

সামাজিক অস্থিরতা
যখন সমাজে গীবত সাধারণ আচরণে পরিণত হয়, তখন সবাই সবার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। ফলে সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বাসের বন্ধন দুর্বল হয়।

দলাদলি ও বিভক্তি
একটি সমাজে যদি একদল মানুষ অন্য দলের বিরুদ্ধে গীবত করে, তাহলে বিভাজন, হিংসা ও দলবাজি বাড়ে।
বিশেষ করে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এ ধরণের গীবতের কারণে সহিংসতা পর্যন্ত দেখা যায়।

সমাজে 'নেতিবাচক সংস্কৃতি'র প্রসার

গীবতকে যদি চুপচাপ মেনে নেওয়া হয়, তবে ধীরে ধীরে তা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। মানুষ মনে করে এটি কোনো বড় অপরাধ নয়।

ফলে:

গীবতকারীর সংখ্যা বাড়ে।

দোষ গোপন রাখার প্রবণতা কমে।

মানুষের সুনাম ও ইজ্জতের গুরুত্ব হারায়।

---

৪. হাদীস ও ইসলামী শিক্ষায় প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব:

হাদীস,

"যে ব্যক্তি অন্যের দোষ প্রকাশ করে বেড়ায়, আল্লাহ তার গোপন দোষ ফাঁস করে দেন—even if he is in the middle of his house."

(তিরমিযী)

এ হাদীস প্রমাণ করে, গীবতের ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা শুধু মানুষের পক্ষ থেকে নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকেও শাস্তি আসতে পারে।

---

৫. সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা:

পারস্পরিক উপদেশ

গীবতের বিরুদ্ধে পরিবারের সদস্যরা যদি একে অপরকে সচেতন করে, তবে তা ধীরে ধীরে নির্মূল হতে পারে।

দ্বীনী শিক্ষা ও তাকওয়ার চর্চা

নবীজী (সা.) এর জীবন ও সাহাবায়ে কিরামের চরিত্র শেখালে মানুষ গীবতের ভয়াবহতা বুঝতে পারে।

মিডিয়ার দায়িত্বশীলতা
সাংবাদিকতা বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের উচিত গীবতমূলক কনটেন্ট বর্জন করা এবং সত্য, শালীন ও গঠনমূলক তথ্য প্রকাশ করা।

গীবতের প্রভাব এতটাই ভয়াবহ যে তা ব্যক্তির আত্মিক অস্থিরতা থেকে শুরু করে সমাজের অস্থিরতাও সৃষ্টি করে। এটি শুধু একটি মৌখিক গুনাহ নয়, বরং পারিবারিক ভাঙন, মানসিক রোগ ও সামাজিক বিভক্তির কারণ। তাই মুসলিম সমাজে গীবতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং তা থেকে রক্ষা পেতে ইসলামী দিকনির্দেশনার চর্চা অপরিহার্য।

১০ম অধ্যায়;ইসলামী মনস্তত্ত্ব ও আখলাকের দৃষ্টিতে গীবত

ইসলামী জীবনব্যবস্থা শুধু বাহ্যিক আচরণ নয়, অন্তরের অবস্থাকেও গুরুত্ব দেয়। ইসলামী মনস্তত্ত্ব বা ইসলামিক সাইকোলজি এমন এক শাস্ত্র যা মানুষের মানসিক অবস্থা, অভ্যাস ও চরিত্রকে আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে বিশ্লেষণ করে। গীবত এমন একটি অভ্যাস যা অন্তরের রোগ থেকে জন্ম নেয় এবং ধীরে ধীরে চারিত্রিক পতন ঘটায়। এ অধ্যায়ে আমরা গীবতকে ইসলামী মনস্তত্ত্ব ও আখলাক (নৈতিকতা) এর আলোকে বিশ্লেষণ করবো।

---

১. গীবতের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি:

অহংকার ও আত্মপ্রশংসা
গীবতকারী অনেক সময় নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করে, এবং অপরের দোষ তুলে ধরে নিজেকে বড় প্রমাণ করতে চায়। কুরআনে বলা হয়েছে:

“আর তুমি নিজের নফসকে পবিত্র বলো না, তিনি (আল্লাহ) ভালো জানেন কে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।”
(সূরা নাজম, আয়াত ৩২)

হীনম্মন্যতা ও আত্ম-অবিশ্বাস
গীবতের আরেকটি ভিত্তি হলো নিজের ঘাটতি ঢাকতে অন্যের সমালোচনা করা। এটি একধরনের আত্মপ্রতারণা ও হীনম্মন্যতা।

হিংসা ও বিদ্বেষ
ইসলামী মনস্তত্ত্বে হিংসা এবং বিদ্বেষকে অন্তরের মারাত্মক রোগ বলা হয়েছে। এ থেকেই গীবত জন্ম নেয়।

হাদীস,
“তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।”
(আবু দাউদ)

২. গীবতের আখলাকি বিশ্লেষণ:

আমানতের খিয়ানত
গীবত করা মানে কারো ব্যক্তিগত দোষ, গোপন বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ করা, যা আমানতের খিয়ানত হিসেবে গণ্য হয়।

খারাপ চরিত্রের প্রতিফলন
ইসলামী নৈতিকতায় সত্যবাদিতা, ধৈর্য, দয়া ও পরের দোষ গোপন রাখাকে মহৎ গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়। গীবত এসব মহৎ গুণকে ধ্বংস করে দেয়।

আল্লাহভীতির অভাব
আখলাকের মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। যে ব্যক্তি গীবত করে, তার মধ্যে এই তাকওয়ার অভাব স্পষ্ট।

---

৩. নফস ও গীবতের সম্পর্ক:

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেন,
"গীবত নফসের পছন্দনীয়, কারণ তা অন্যের পতন ঘটিয়ে নিজেকে উপরে তোলার সুযোগ দেয়। তবে মুমিনের নফস তা থেকে দূরে থাকে।"
(ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন)

গীবতকারীর নফস (আত্মা) মূলত মন্দ প্রবৃত্তির অধীন হয়ে পড়ে। ইসলামে 'তাসফিয়াতুন নফস' তথা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে এই প্রবৃত্তিকে সংযত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

৪. আত্মশুদ্ধি ও গীবত বর্জনের উপায়:

আত্মসমালোচনা ও মুরাকাবা

প্রতিদিন নিজের কথাবার্তা ও অভ্যাস যাচাই করা, গীবত হয়েছে কি না তা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে বুঝে নেওয়া।

দো'আ ও ইস্তেগফার

নবী করীম (সা.) সর্বদা দো'আ করতেন:
"হে আল্লাহ! আমার জিহ্বাকে মন্দ কথায় ব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা কর।"

আল্লাহর ভয় জাগিয়ে রাখা

যে ব্যক্তি জানে গীবতের কারণে কিয়ামতের দিন তার নেক আমল ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সে সচেতন থাকে।

৫. হৃদয়ের রোগ হিসেবে গীবত:

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন,
"গীবত হলো হৃদয়ের একটি রোগ, যা ধীরে ধীরে আত্মাকে কলুষিত করে তোলে।"

এ রোগের চিকিৎসা:
অন্যের প্রশংসা করতে শেখা।
অন্তরের হিংসা ও অহংকারকে দমন করা।
পরকালের জবাবদিহিতা স্মরণ রাখা।

ইসলামী মনস্তত্ত্ব ও আখলাকের দৃষ্টিতে গীবত কেবল একটি মৌখিক অপরাধ নয়, বরং এটি আত্মার রোগ, চরিত্রের দুর্বলতা এবং তাকওয়ার অভাবের প্রতিফলন। এটি একজন মানুষকে আত্মিকভাবে ধ্বংস করে দেয় এবং সমাজে অনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়। তাই ইসলামী শিক্ষায় গীবতকে চরমভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও সদাচরণের মাধ্যমে এই অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

—

১১তম অধ্যায়;গীবতের ভয়াবহতা

ইসলামে গীবতকে এমন এক ভয়াবহ গোনাহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যার দ্বারা শুধু ব্যক্তি নয়, গোটা সমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। গীবত মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে, িসদৃষ্টিকোণে গীবত শুধু মুখের গোনাহ নয়, বরং এটি আত্মিক রোগ—যার ফলাফল দুনিয়াতওথআখিরাতে অত্যন্ত ভয়াবহ।

---

১. কুরআনের ভাষায় গীবতের রূপ:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা গীবতের বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন:

> "হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেউ কারো পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করবে। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের তওবা কবুলকারী ও দয়ালু।"
— সূরা হুজরাত: ১২

এই আয়াতে গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটি শুধু একটি কাব্যিক উপমা নয়, বরং গীবতের প্রকৃত ভয়াবহতা বোঝাতে এক বাস্তবিক চিত্র। একজন মৃত মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে অনুপস্থিত কাউকে নিয়ে অপবাদ বা সমালোচনা করাও একইভাবে জঘন্য।

---

২. হাদীসে গীবতের ভয়াবহতা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতের ব্যাপারে বলেছেন:

> “তোমরা জানো গীবত কী? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, গীবত হলো, তুমি তোমার ভাইয়ের এমন কথা বল, যা সে অপছন্দ করে। যদি তোমার বলা কথা তার মধ্যে থেকেই থাকে, তবে সেটা গীবত; আর যদি না থাকে, তবে তা বুহতান (অপবাদ)।”
> — সহীহ মুসলিম: ২৫৮৯

এই হাদীসে গীবতের সংজ্ঞা যেমন দেওয়া হয়েছে, তেমনি বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, গীবত সত্য হলেও তা গোনাহ এবং মিথ্যা হলে তা আরও ভয়াবহ অপবাদ।

৩. কবরের শাস্তি গীবতের কারণে:

একবার রাসূল (সা.) একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন:

> “এরা উভয়ে (কবরবাসী) কবরের আযাবে পতিত হচ্ছে। অথচ বড় কোনো কারণে নয়। একজন গীবত করত, আর অন্যজন পেশাব থেকে পরিশুদ্ধ হতো না।”
> — সহীহ বুখারী: ২১৮, সহীহ মুসলিম: ২৯২

এখানে বোঝা যায়, গীবতের মতো কথিত ‘সামান্য’ পাপও কবরের আযাবের কারণ হতে পারে। এটি গীবতের আখিরাতকেন্দ্রিক ভয়াবহতা স্পষ্ট করে তোলে।

৪. কিয়ামতের দিনে আমলনামার ক্ষতি:

গীবত এমন এক গোনাহ, যার কারণে নেক আমল অন্যদের কাছে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

> “তোমরা জানো কে দেউলিয়া? সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে দেউলিয়া সেই, যার কাছে ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের দেউলিয়া হলো সেই, যে কিয়ামতের দিন আসবে—নামায, রোযা, যাকাত থাকবে, কিন্তু কারও গালি দিয়েছে, কারও উপর অপবাদ

দিয়েছে, কারও সম্পদ খেয়েছে, কারও রক্ত ঝরিয়েছে—তখন তার নেক আমলগুলো তাদেরকে দেওয়া হবে, এবং যদি তার নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের পাপ তাকে দেওয়া হবে, এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"
— সহীহ মুসলিম: ২৫৮১

এ হাদীস স্পষ্ট করে দেয়, গীবতের মতো সামাজিক অপরাধ কিয়ামতের দিন ব্যক্তির মুক্তির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

৫. গীবতের সামাজিক প্রভাব:

গীবতের ভয়াবহতা শুধু পরকালীন নয়, বরং এটি দুনিয়াতেও সম্পর্ক নষ্ট করে, সমাজে ফাটল ধরায় এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। গীবতের কারণে—

বন্ধুত্ব নষ্ট হয়,
পরিবারে বিবাদ তৈরি হয়,
মসজিদ ও মাদ্রাসায় দ্বন্দ্ব বাড়ে,
সমাজে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ বাড়ে।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন:
> "গীবত একধরনের হৃদয়ের রোগ, যা হিংসা, অহংকার, রাগ কিংবা উপহাসপ্রবণতা থেকে সৃষ্টি হয়।"
— ইহ্যাউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড ৩

এটি বোঝায় যে, গীবতের পেছনে রয়েছে আত্মিক দুর্বলতা, যা আত্মশুদ্ধি ছাড়া নির্মূল হয় না।

৬. গীবতকারীকে কঠিন শাস্তির স্বপ্ন দেখানো হয়েছে:

রাসূল (সা.) এক রাতে স্বপ্নে দেখেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে এক পাশ থেকে আরেক পাশে পর্যন্ত। তিনি জিজ্ঞেস করলে বলা হয়:

> "এই ব্যক্তি ছিল, যে গীবত করত এবং মানুষের সম্মানহানি করত। এজন্য তাকে এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।"

— সহীহ বুখারী: ৭০৪৭

এই স্বপ্নবর্ণনা গীবতকারীর চেহারাগত বিকৃতি ও আখিরাতের শাস্তির ভয়ানক চিত্র তুলে ধরে।

৭. গীবতের স্বরূপ চিনে সতর্ক হওয়া জরুরি:

হাদীস ও কুরআনের আলোকে, গীবতের কিছু সাধারণ রূপ নিম্নরূপ—
কারও কাজ বা অভ্যাসের উপহাস করা।
কারও পরিবার বা বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা।
কোনো মুসলিম ভাইয়ের গোপন বিষয় জনসম্মুখে বলা।
মুখের ভাষা ছাড়াও লিখিত বা ইঙ্গিতেও গীবত হতে পারে।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন:
> "গীবত শুধু মুখের কথা নয়; চোখের ইঙ্গিত, হাতের চালচলন, এমনকি লেখা ও চিত্রেও গীবত হতে পারে।"
— আল-আযকার, ইমাম নববী

গীবতের ভয়াবহতা এতটাই বড়, যে এটি একজন ঈমানদারের সব আমল ধ্বংস করে দিতে পারে। ইসলামে গীবতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে শুধু এজন্য নয় যে, এটি একটি 'পাপ'—বরং এটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ধ্বংস করে, সমাজে বিষ ছড়ায়, আখিরাতে মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে। একজন প্রকৃত মুসলিমের দায়িত্ব—নিজের জবান, কলম ও অন্তরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে গীবতের স্থান থাকবে না।

১২তম অধ্যায়;গীবতের দুনিয়াবী ও আখিরাতের পরিণাম

গীবত এমন একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি, যার প্রভাব কেবল বক্তার জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা পুরো সমাজ, পরিবার এবং উম্মাহর মধ্যে অশান্তি, বিভাজন এবং অনৈক্য ছড়িয়ে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত একটি গুরুতর গোনাহ, যার শাস্তি দুনিয়াতেও প্রতিফলিত হয় এবং আখিরাতেও ভয়াবহ পরিণতির কারণ হয়। এই অধ্যায়ে আমরা গীবতের দুনিয়াবী ও আখিরাতের পরিণাম বিশ্লেষণ করবো।

---

১. দুনিয়াবী পরিণাম:

ব্যক্তিগত সম্মানহানি

গীবতকারী ব্যক্তি ধীরে ধীরে সমাজে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। মানুষ তার উপস্থিতিতে সতর্ক হয়ে যায়, এবং তার বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসে। গীবতের ফলে একজন মানুষ পরনিন্দাকারী হিসেবে পরিচিত হয়, যা তার সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

> আলী (রাঃ) বলেন:
"যে ব্যক্তি অধিক কথা বলে, সে অধিক ভুল করে; আর যে অধিক ভুল করে, তার লজ্জা কমে যায়; আর যার লজ্জা কমে যায়, তার তাকওয়া নষ্ট হয়ে যায়; যার তাকওয়া নষ্ট হয়ে যায়, তার হৃদয় মৃত হয়ে যায়।"
— ইমাম গাযযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন

পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের অবনতি

গীবত পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। আত্মীয়দের মধ্যে সন্দেহ, ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্ম নেয়। বিশেষ করে পরিবারের কোনো সদস্যকে নিয়ে গীবত করলে পারস্পরিক সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। একবার কারও নামে কিছু বলা হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

আমলের বরকত হ্রাস

আল্লাহতায়ালা গীবতকারীর নেক আমল থেকে বরকত উঠিয়ে নেন। অনেক সময় এমন হয়—ব্যক্তি নামাজ, রোযা, দান-সদকা করলেও তার জীবনে প্রশান্তি থাকে না। কারণ, তার আমলে গীবত, রিয়া বা অহংকারের মতো রোগ মিশে যায়।

২. আখিরাতের পরিণাম:

নেক আমল অন্যের কাছে হস্তান্তর

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

> "কিয়ামতের দিন একজন মানুষ আসবে, যার কাছে নামাজ, রোযা, যাকাত থাকবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারও সম্মান নষ্ট করেছে, কারও উপর অপবাদ দিয়েছে, কারও মাল খেয়েছে। তখন তার নেক আমল তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। এরপর যদি তার নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের পাপ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

— সহীহ মুসলিম: **২৫৮১**

এই হাদীস গীবতের ভয়াবহ আখিরাতের পরিণতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। আমাদের জীবনের সব কষ্টসাধ্য আমল যদি অন্যের নামের হয়ে যায়, তাহলে আর মুক্তির উপায় থাকবে না।

কবরের আযাব

রাসূল (সা.) একবার দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন:

> "তারা কবরের আযাবে পতিত হচ্ছে। একজন পেশাব থেকে পরিষ্কার হতো না, আর অন্যজন মানুষের মাঝে গীবত করত।"

— সহীহ বুখারী: **২১৮**

এখানে বোঝা যায়, গীবতের কারণে একজন ব্যক্তি মৃত্যুর পরও চিরন্তন শাস্তি ভোগ করে, যা তার কবরজীবনকে কঠিন করে তোলে।

মুনাফিকদের গুণ

গীবত করা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। কুরআনে গীবতকারীকে "হাম্মাজ মাশশা'ইন বিন নামীমাহ" (অর্থ: গীবতকারী ও চোগলখোর) বলা হয়েছে।

> "ধ্বংস তাদের জন্য যারা পেছনে নিন্দা করে ও সম্মুখে অপমান করে।"

— সূরা হুমাযাহ: **১**

এ আয়াতে “হুমাযাহ ও লুমাযাহ” দ্বারা এমন লোককে বোঝানো হয়েছে, যে সবসময় অন্যের দোষ ধরে বেড়ায় এবং অপমান করে। কিয়ামতের দিন এমন ব্যক্তিদের জন্য ভয়ানক শাস্তি নির্ধারিত আছে।

জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া

গীবত এমন একটি গোনাহ যা জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হাদীস শরীফে এসেছে:

> “গীবতকারীরা কিয়ামতের দিন তাদের জিহ্বা আগুনে পুড়তে থাকবে।”
— মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস: ৪৮৫২

অতএব, একজন গীবতকারী যদি এ থেকে তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জন্য জান্নাতের পথ কঠিন হয়ে যায়।

---

৩. গীবতের পরিণতি—ইতিহাসের দৃষ্টিতে:

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, যারা গীবতের অভ্যাস করত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.)-কে নিয়ে গীবতের ঘটনাটি (ইফক) এর অন্যতম উদাহরণ। যারা গীবত করেছিল, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

> “তোমরা এটা শুনেই কেন বললে না: এটা তো এক স্পষ্ট মিথ্যা?”
— সূরা নূর: ১৬

এই ঘটনায় অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবি হযরত মিস্তাহ (রাঃ) ছিলেন, যিনি মুহাজিরদের মধ্যে অন্যতম। অথচ গীবতে অংশ নেয়ার কারণে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আয়াত নাজিল করেছেন এবং সাহাবিদের সতর্ক করেছেন।

---

৪. গীবতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া না জানালে শাস্তি:

যে ব্যক্তি গীবত শুনে চুপ থাকে, সে পরোক্ষভাবে গীবতকে সমর্থন করে। হাদীসে এসেছে:

> “যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করলো অনুপস্থিতিতে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।”
— তিরমিজি: **১৯৩১**

অতএব, গীবত শোনা ও চুপ থাকা দুটিই গোনাহে পরিণত হয়, যদি না সে প্রতিবাদ করে।

গীবতের দুনিয়াবী পরিণাম যেমন সামাজিক সম্মানহানি, সম্পর্কচ্ছেদ ও আত্মিক অশান্তি— তেমনি আখিরাতের পরিণাম আরও ভয়াবহ। কবরের আযাব, আমলের বিনাশ, জাহান্নামের শাস্তি—সবই গীবতের ফলাফল হতে পারে। গীবত শুধু ব্যক্তির নয়, বরং সমাজের ধ্বংস ডেকে আনে। তাই একজন মুমিনের উচিত, গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া, নিজেকে এ থেকে দূরে রাখা, অন্যকেও বাঁচানো এবং প্রয়োজন হলে গীবত থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করা।

১৩তম অধ্যায়;গীবত থেকে বাঁচার উপায়

ইসলামে গীবত একটি মারাত্মক সামাজিক ও ধর্মীয় অপরাধ। এই পাপ থেকে আত্মরক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। গীবতের ভয়াবহতা অনুধাবন করেই একজন মু'মিন এই অভ্যাস থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সচেষ্ট হয়। নিম্নে গীবত থেকে বাঁচার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায় আলোচনা করা হলো:

আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার চর্চা

আল্লাহ তাআলার ভয় এবং আখিরাতে জবাবদিহিতার চিন্তা একজন মানুষকে গীবতের মতো গোনাহ থেকে বিরত রাখতে পারে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

> "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।"
(সূরা আত-তাওবা: **১১৯**

তাকওয়ার আলো হৃদয়ে জ্বলে উঠলে মানুষ অন্যের দোষচর্চা থেকে বিরত থাকে এবং নিজের আমল ঠিক রাখার জন্য সচেষ্ট হয়।

আত্মসমালোচনার অভ্যাস

নিজের ভুল, গুনাহ ও ত্রুটির দিকে মনোযোগ দিলে অন্যের দোষ দেখার সময় থাকে না। হাদীসে এসেছে:

> "ধন্য সেই ব্যক্তি, যে তার নিজের দোষ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, অন্যের দোষ নিয়ে নয়।"
(তিরমিযি, হাদীস: ২৫০২)

এটি গীবত থেকে বাঁচার একটি কার্যকর পন্থা, যা আত্মসংশোধনের দ্বার খুলে দেয়।

নীরবতা ও সংযত বাক্যচর্চা

অপ্রয়োজনে কথা বলা গীবতের দরজা খুলে দেয়। প্রিয় নবী (সা.) বলেন:

> "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"
(বুখারি, হাদীস: ৬০১৮)

নীরবতা মানুষকে অনেক অনর্থক কথা ও গীবতের মত গুনাহ থেকে রক্ষা করে।

ভালো বন্ধু নির্বাচন

যে সমাজ বা পরিবেশে গীবত সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে থেকে নিজেকে দূরে রাখা উচিত। হাদীসে বলা হয়েছে:

> "মানুষ তার বন্ধুদের ধর্মের ওপর থাকে। তাই তোমরা কার সাথে বন্ধুত্ব করছো তা দেখো।" (আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৩৩)

ভালো ও নেককার বন্ধু গীবতের পরিবর্তে নসীহত ও উপদেশ দিয়ে সহানুভূতির মনোভাব তৈরি করে।

গীবতের ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন

গীবতের ভয়াবহতা ও আখিরাতের শাস্তির বর্ণনা শুনলে অনেক সময় মানুষ সচেতন হয়। যেমন, রাসূল (সা.) বলেছেন:

> "মি'রাজে আমি এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলাম যাদের নখ ছিল তামার এবং তারা নিজেদের মুখ ও বুকে আঁচড়াচ্ছিল। আমি বললাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা তারা যারা গীবত করত এবং মানুষের সম্মান নষ্ট করত।"
> (আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৭৮)

এই ধরনের হাদীস মানুষের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে এবং গীবত থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে।

--

সময়ের সদ্ব্যবহার ও আমলের প্রতি মনোযোগ

যে ব্যক্তি প্রতিদিনের সময়কে ইবাদত, জ্ঞান অর্জন, দান-সদকা বা ভালো কাজে ব্যয় করে, তার পক্ষে গীবতের মতো ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন:

> “যদি তুমি নিজেকে হক্কানী কাজে ব্যস্ত না রাখো, তাহলে বাতিল তোমাকে ব্যস্ত করে ফেলবে।”

গীবতের প্রবণতা তখনই তৈরি হয় যখন মানুষ সময় নষ্ট করে, অলস থাকে এবং অন্তঃসারশূন্য কথায় সময় ব্যয় করে।

গীবতকারীর সাথে সম্পর্ক সীমিত করা

যে ব্যক্তি বারবার গীবত করে, তার সাহচর্য এড়িয়ে চলাই উত্তম। যদি নসীহত করে বন্ধ না করা যায়, তবে তার মজলিসে বসা থেকে বিরত থাকা উচিত। পবিত্র কুরআনে এসেছে:

> "তোমরা যখন শোনো যে আল্লাহর আয়াতসমূহে কটাক্ষ করা হচ্ছে এবং উপহাস করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সঙ্গে বসো না যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় প্রবেশ করে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে।"
(সূরা আন-নিসা: ১৪০)

এটি গীবতের পরিবেশ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা।

পরকালীন শাস্তির ভয় সৃষ্টি করা

পরকালের কঠিন হিসাব ও শাস্তির ভয় অনেক বড় প্রেরণা হতে পারে। গীবতের কারণে কারো নেক আমল অন্যের নামে চলে যাবে, আর অন্যের পাপ নিজের ঘাড়ে চলে আসবে—এটি এক ভয়াবহ পরিণাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

> "কেউ যদি তার ভাইয়ের ইজ্জত নষ্ট করে, তবে সে যেন আজই ক্ষমা চায়, অন্যথায় কিয়ামতের দিন তার নেক আমল নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কোনো নেক আমল না থাকে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাপ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।"
(বুখারি, হাদীস: ২২৬৯)

এই হাদীসের প্রতিফলনেই বোঝা যায় গীবতের ভয়াবহতা কত বড়, এবং এটি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কতটা সচেতন হতে হয়।

গীবতের পরিবর্তে দোআ ও সদাচার

কোনো ব্যক্তির দোষ বা দুর্বলতা চোখে পড়লে, সেটিকে আলোচনার মাধ্যমে ছড়িয়ে না দিয়ে, তার জন্য দোআ করা এবং সদুপদেশ প্রদান করা একটি উত্তম পন্থা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

> "তোমরা ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ থেকে বিরত রাখো।"

(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

এই আয়াতের আলোকে সমাজে গীবতের বদলে সদাচার এবং সংশোধনের মনোভাব জাগিয়ে তোলা জরুরি।

আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া

সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে আল্লাহর কাছে গীবতের মতো গোনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক চাওয়া। রাসূল (সা.) দোআ করতেন:

> "হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে পাক করুন, আমার গুনাহ ক্ষমা করুন এবং আমাকে হেফাজত করুন।"

এই দোআগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করতে পারি এবং গীবতের মতো পাপ থেকে দূরে থাকতে পারি।

১৪তম অধ্যায়;গীবতের পরিবর্তে বিকল্প সুন্দর ব্যবহার

মানুষ সামাজিক জীব, আর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মতবিরোধ, অসন্তোষ ও ভুলত্রুটি স্বাভাবিক। তবে এসব বাস্তবতা প্রকাশ করতে গিয়ে যদি তা গীবতের রূপ নেয়, তাহলে তা মারাত্মক গুনাহ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে, কীভাবে গীবতের পরিবর্তে সুন্দর, সদ্ব্যবহার ও ইতিবাচক পন্থায় কথা বলা যায়। গীবত নয়—মানবিক, সদয় ও পরামর্শমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করাই উত্তম।

---

১. নীরবতা: সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্প:

হাদিসে এসেছে—

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"
(সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

নীরবতা গীবত থেকে রক্ষা করে এবং আত্মসংযম শেখায়। অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় সমালোচনা না করে চুপ থাকাই উত্তম আচরণ।

---

২. উপদেশমূলক ও পরোক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তরিকার আলোকে কেউ ভুল করলে তার নাম উল্লেখ না করে বলেন—
"কি হয়েছে কিছু লোকের, যারা এ রকম কাজ করছে?"
(সহীহ মুসলিম)

এই পদ্ধতি কাউকে অপমান না করে সংশোধনের সুযোগ দেয়। গীবতের বদলে পরোক্ষভাবে উপদেশ দিয়ে অন্যায় রোধ করা একটি উত্তম বিকল্প।

৩. পরামর্শ ও নসীহতমূলক কথা বলা:

গীবতের বদলে কারো খারাপ দিক আলোচনা করার প্রয়োজন হলে তা তার উপস্থিতিতেই নম্রভাবে বলা উত্তম, যেন সে সংশোধন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ—

"ভাই, আপনি যদি অমুক কাজটা না করতেন, আরও ভালো হতো।"

"আপনার এই অভ্যাসটা অনেকের কাছে ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে।"

এভাবে বললে তা গীবত হয় না বরং নসীহত হয়।

---

৪. দো'আ ও ইতিবাচক মনোভাব:

হাদিসে এসেছে—

"তুমি যদি কারো মধ্যে দোষ দেখ, তাহলে তার জন্য হিদায়াতের দো'আ করো।"

গীবতের পরিবর্তে আমরা সেই ব্যক্তির জন্য দো'আ করলে নিজের মন পরিষ্কার হয় এবং সম্পর্কও নষ্ট হয় না।

---

৫. দোষ খোঁজার পরিবর্তে গুণ প্রশংসা করা:

মানুষের জীবনে ভুল-ত্রুটি থাকলেও তার ভালো দিকগুলোও রয়েছে। গীবত না করে সেই ব্যক্তির ভালো দিক তুলে ধরলে সমাজে ইতিবাচকতা ছড়ায়। যেমন:

"হ্যাঁ, তার কিছু সমস্যা আছে, তবে সে খুব সাহায্যপ্রবণ।"

"সে হয়তো মাঝে মাঝে রাগ করে, কিন্তু কাজে মনোযোগী।"

এভাবে দোষ চাপিয়ে না দিয়ে প্রশংসার ভাষায় কথা বললে গীবত হয় না।

৬. কথা বলার আগে যাচাই ও নিয়ত বিশুদ্ধ করা:

কুরআনের আদেশ—

“হে মুমিনগণ! যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখো।”
(সূরা হুজুরাত, আয়াত ৬)

কারো বিষয়ে নেতিবাচক কিছু শোনার পর যাচাই না করে বললে তা গীবতের কারণ হতে পারে। সুতরাং ভাষা ব্যবহারে নিয়ত বিশুদ্ধ করা অপরিহার্য।

৭. সামাজিক ও পারিবারিক আলোচনায় সতর্কতা:

পারিবারিক আড্ডা বা বন্ধুদের মাঝে অনেক সময় অজান্তেই গীবত হয়ে যায়। এজন্য উচিত—

আলাপের বিষয়বস্তু সচেতনভাবে নির্ধারণ করা

কাউকে অনুপস্থিত ব্যক্তির দোষ না বলার অনুরোধ করা

ইতিবাচক গল্প বা উপদেশমূলক আলোচনা চালু করা

---

৮. ইসলামী শিক্ষার প্রসার:

মসজিদ, মাদ্রাসা, সামাজিক সংগঠন, মিডিয়া—এসব মাধ্যমে গীবতের ভয়াবহতা ও বিকল্প আচরণ নিয়ে আলোচনা ও শিক্ষা দেওয়া জরুরি।
গীবত সমাজের জন্য একটি বিষ। তবে ইসলাম তার বিকল্প হিসেবে অনেক সুন্দর ব্যবহার ও আচরণ শিক্ষা দিয়েছে। একজন মুমিনের উচিত—সদ্ব্যবহার, উপদেশ, দো‘আ, নীরবতা ও পরিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দেওয়া। এইভাবেই আমরা গীবতমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারি, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।

১৫তম অধ্যায়;সমাজ গঠনে গীবতমুক্ত পরিবেশ

একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাস, এবং সদ্ব্যবহারের পরিবেশ। কিন্তু গীবত এই মৌলিক নৈতিক গুণগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। গীবত সমাজে অবিশ্বাস, শত্রুতা, হিংসা ও বিভক্তির সৃষ্টি করে। তাই ইসলাম গীবতের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি প্রদান করেছে এবং একটি গীবতমুক্ত সমাজ গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে।

---

১. গীবতের সামাজিক প্রভাব:

পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি

যখন কেউ কারো অনুপস্থিতিতে দোষ বলে, তখন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দুর্বল হয়ে যায়। বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক চিরে গিয়ে শত্রুতায় রূপ নেয়।

সমাজে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিস্তার

গীবত একটি গোপন অস্ত্র যা মানুষকে একে অপরের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেয়। ফলে সমাজে বিশ্বাস হারিয়ে যায়।

দলাদলি ও বিভক্তির সৃষ্টি

গীবত মানুষকে গোষ্ঠীতে ভাগ করে দেয়। একপক্ষ আরেক পক্ষের দোষ খুঁজতে থাকে, ফলে সমাজে একতা বিলুপ্ত হয়।

---

২. ইসলামি নির্দেশনা: গীবতমুক্ত সমাজ গঠনের উপায়:

কুরআনের নির্দেশ

"হে মুমিনগণ! কেউ যেন অপর কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে... তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে?"
(সূরা হুজুরাত, আয়াত ১২)

এই আয়াতে শুধু গীবতের নিষেধ নয়, বরং সমাজে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশনা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ
তিনি কখনও কারো দোষ ধরে বলতেন না বরং বলতেন,
"লোকেদের কী হয়ে গেছে যে তারা এমন কাজ করছে?"
(সহীহ মুসলিম)

এভাবে তিনি ব্যক্তির দোষ না বলে, সমাজ সংশোধনের চেষ্টা করতেন।

---

৩. পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে গীবত প্রতিরোধ:

পারিবারিক শিক্ষা
গীবত বন্ধের সূচনা হতে হবে পরিবার থেকে। পিতা-মাতা যদি নিজেদের সন্তানদের গীবতের কুফল শেখায় ও নিজেরাও গীবত থেকে বিরত থাকে, তাহলে তা প্রভাব ফেলবে প্রজন্মের উপর।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সচেতনতা
মাদ্রাসা, স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে গীবতকে একটি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত।

সামাজিক প্ল্যাটফর্মে গীবতের প্রতিরোধ
আজকের যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও গীবত ছড়ানো হয়। ইসলামি নীতিমালা অনুসরণ করে এ মাধ্যমগুলিতে সচেতনতা ছড়াতে হবে।
৪. গীবতমুক্ত সমাজের সুফল:

আত্মিক শান্তি: মানুষ একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।

সামাজিক ঐক্য: পারস্পরিক বিশ্বাস বাড়ে, সমাজ ঐক্যবদ্ধ থাকে।

পরকালীন মুক্তি: ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

---

৫. বাস্তবায়নের কৌশল:

আত্মসমালোচনা ও পরিশুদ্ধি
প্রতিদিন নিজের আচরণ পর্যালোচনা করতে হবে।

দোষ খোঁজার বদলে দো'আ করা
কারো দোষ দেখলে গীবত না করে তার জন্য হিদায়াতের দো'আ করা উচিত।

সমাজে ইতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে তোলা
মসজিদে, মাহফিলে, ধর্মীয় বক্তৃতায় গীবতের ভয়াবহতা এবং প্রতিকার নিয়ে আলোচনা বৃদ্ধি করতে হবে।

একটি গীবতমুক্ত সমাজ গঠন শুধু একটি ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি সামাজিক চাহিদাও। গীবত মানুষকে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করে, সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে গীবতমুক্ত সমাজে পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়। তাই আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো নিজেকে গীবত থেকে মুক্ত রাখা এবং সমাজে এই নৈতিকতা ছড়িয়ে দেওয়া।

সারসংক্ষেপ (Abstract)

ইসলামে গীবত একটি জঘন্য গুনাহ হিসেবে বিবেচিত। এই থিসিসে গীবতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, কুরআন ও হাদীসের আলোকে গীবতের নিন্দা, এর ভয়াবহতা, দুনিয়াবী ও আখিরাতের পরিণাম এবং সামাজিক প্রভাব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক সমাজে গীবতের বহুবিধ রূপ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর প্রসার এবং এর ফলে উদ্ভূত নৈতিক অবক্ষয় নিয়েও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি গীবতের উৎসসমূহ, আত্মিক ও সামাজিক প্রতিকার, গীবতের বিকল্প ইতিবাচক ব্যবহার এবং গীবতমুক্ত সমাজ গঠনের উপায়সমূহ প্রস্তাব করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে—একটি সুস্থ, নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে গীবতের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে জীবন পরিচালনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

সূত্র তালিকা (References)

কুরআনুল কারীম:

1. আল-কুরআন, সূরা হুজরাত, আয়াত: ১২
2. সূরা তওবা: ৬৮
3. সূরা কাওসার
4. সূরা আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১

হাদীস:

1. সহীহ মুসলিম
2. সহীহ বুখারী
3. তিরমিজী শরীফ
4. আবু দাউদ
5. মিশকাতুল মাসাবীহ
6. রিয়াদুস সালেহীন – ইমাম নববী (রহ.)

গ্রন্থসমূহ:

1. আল-আদাবুল মুফরাদ – ইমাম বুখারী
2. ইসলামী আখলাক ও চারিত্রিক গুণাবলি – মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)
3. তাফসীর ইবনে কাসীর – ইবনে কাসীর (রহ.)
4. ইসলামে সামাজিক অপরাধ – মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী
5. আধুনিক সমাজে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি – ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

অনলাইন রেফারেন্স:

1. www.islamqa.info
2. www.quranenc.com
3. www.sunnah.com